আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল

(টেলিফোনের জনক)

পরিমল পাত্র

গ্রন্থতীর্থ

GRANTHA TIRTHA CALCUTTA

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ ভূমিকা ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পরবর্তী যুগান্তকারী আবিষ্কার হল টেলিফোন যা যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অতি মন্থর—মানুষ ঘোড়ায় চড়ে বা ঘোড়ার গাড়িতে ডাক বয়ে নিয়ে যেত। ওই শতাব্দীর মাঝামাঝি স্যামুয়েল মর্স তৈরি করলেন টেলিগ্রাফ যন্ত্র। যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রথম পরিবর্তন সাধিত হল। এই টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর কাজে সেই সময় একাধিক বিজ্ঞানী ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁদেরই অন্যতম হলেন আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল। হারমোনিক টেলিগ্রাফ নিয়ে গবেষণার সময় যন্ত্রটিতে একটি ত্রুটি দেখা দেয়। ত্রুটিপূর্ণ রিডটি সরিয়ে নেবার সময় হঠাৎ একটা সাংকেতিক শব্দ গ্রাহকযন্ত্রে এসে পৌঁছোয়। এভাবে অযাচিতভাবে শব্দশক্তিকে বিদ্যুতে পরিণত করে তারের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করার মূলনীতি আবিষ্কার করলেন আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল।

যুগান্তকারী এই আবিষ্কার আজ নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই আবিষ্কারের কাহিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই পুস্তকটিতে।

পুস্তকটি রচনায় আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শংকরী ভূষণ নায়ক, তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। রচনায় আর যাঁরা তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁরা হলেন আমার সহকর্মী শ্রী পুলক

কুমার বড়াল ও শ্রী পঙ্কজ দেওয়ান। তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ থাকছি।

বইটি ছোটোদের মনে বিজ্ঞানজনিত কৌতূহল সৃষ্টি করলে আমার শ্রম সার্থক।

রাজডাঙা, কলকাতা
১৫.১২.২০১৩

পরিমল পাত্র

সূচিপত্র

গোড়ার কথা	০৯
বংশ পরিচয়	১১
শৈশবের দিনগুলি	১২
ছাত্রজীবন	১৭
জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে	২৩
জীবিকার সন্ধানে	২৯
হাবার্ড পরিবারের সান্নিধ্য	৩৬
যোগাযোগ মাধ্যম টেলিগ্রাফের কথা	৩৯
শখের বিজ্ঞানী	৪৬
টেলিগ্রাফ থেকে টেলিফোন	৫০
টেলিফোন আবিষ্কার	৬৩
টেলিফোনের পেটেন্ট	৬৯
জনমানসে টেলিফোনের প্রচার	৮৬
টেলিফোন-ভীতি — অপপ্রচার	৯৩
টেলিফোনের প্রথম গ্রাহক—বিস্তার লাভ	৯৯
পারিবারিক জীবন	১০৪
বহুমখী প্রতিভা	১১৬

প্রতিষ্ঠান ও সম্মান ১২৮
দূরদর্শিতা ১৩৩
শেষের সে দিন ১৩৮
আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের জীবনপঞ্জি ১৪০
দিনপঞ্জি ১৪১

॥ গোড়ার কথা ॥

স্কটল্যান্ডের সুন্দর সাজানো-গোছানো একটি শহর এডিনবরা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এডিনবরা ছিল স্কটল্যান্ডের সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রস্থল। আজ থেকে প্রায় একশো পঁয়ষট্টি বছর আগে, আমাদের স্বাধীনতারও একশো বছর আগে বিশ্বে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল না। বিশাল চওড়া চওড়া রাজপথ— গাড়ি বলতে কেবল ঘোড়ায় টানা গাড়ি। লোকজন হেসে খেলে স্বচ্ছন্দে পথ চলতে পারত। আজকের দিনের মতো যানজট তখন কল্পনারও বাইরে ছিল।

ইটালির 'ব্যাং নাচানো অধ্যাপক' আলেসান্দ্রো ভোল্টা একদিন মরা ছাল ছাড়ানো ব্যাঙের পা লবণজলে চুবিয়ে লোহার স্ট্যান্ডে লাগানো তামার হুকে ঝুলিয়ে রেখেছেন পরীক্ষার জন্যে। হাওয়ায় দুলে ব্যাঙের পা লোহার স্ট্যান্ডে লাগার সঙ্গে সঙ্গে মরা ব্যাং- এর পা জোরে সংকুচিত হয়ে উঠল। এভাবেই আকস্মিকভাবে তিনি আবিষ্কার করেন তড়িৎ কোশ—রাসায়নিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি পাবার কোশ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে একদিন গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি গুছিয়ে রাখার সময় একটি তামার তারের কুণ্ডলীর মধ্যে একটা দণ্ড চুম্বকের একদিক প্রবেশ করিয়ে দিতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তারের কুণ্ডলীতে তড়িৎ উৎপন্ন হয়েছে। এভাবে এখন থেকে প্রায় দুশো বছর আগে আবিষ্কৃত

হল আবেশ-তড়িৎ। এর ওপর ভর করেই আজকের দুনিয়া বিজ্ঞানের অগ্রগতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে।

কিন্তু তা হলে কী হবে, ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিদ্যুতের বহুল ব্যবহার জানা ছিল না। রাস্তায় তখনও গ্যাস বাতি জ্বলত। মানুষ পিঠে ডাক বয়ে নিয়ে যেত। জরুরি ডাক ও সরকারি চিঠিপত্র অশ্বারোহী ডাকহরকরার মাধ্যমে পাঠানো হত। মাঝে মাঝে ঘোড়া বদলে নেবার ব্যবস্থা ছিল। ঠিক যেন রূপকথার জগৎ। এতে সময় বাঁচত কিন্তু খরচ হত প্রচুর। 'দ্য পোনি এক্সপ্রেস' কোম্পানি এভাবেই মিসৌরি থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত প্রায় দুহাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সরকারি ডাক পৌঁছে দিত। এর অনেক পরে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু হলে ডাক যোগাযোগে কিছুটা উন্নতি হয়। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ব্যাবহারিক ফল তখন ফলতে শুরু করেছে।

বিদেশ ভ্রমণ তখনকার দিনে ছিল এক মূর্তিমান সমস্যা। জাহাজে সমুদ্রপথে যেতে হত। বহুদিন থাকতে হত জাহাজে। জাহাজ যাত্রাও সুখের ছিল না। বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ, সামুদ্রিক ঝড় মানুষকে নাস্তানাবুদ করে তুলত, অসুস্থ করে তুলত। জাহাজডুবিতে হাজার হাজার প্রাণ বলি হত। কিন্তু তবু প্রয়োজনে মানুষ যেত। কাজের সন্ধানে বা জীবিকার সন্ধানে। এদের মধ্যে খুব কমই আবার নিজের জন্মভূমিতে ফিরে আসার সৌভাগ্যলাভ করত, মিলিত হতে পারত আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে। বেশির ভাগই পড়ে থাকত বিদেশ বিভুঁই-এ। আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী, নিজের জন্মভূমি পড়ে থাকত সাগর পারে। জীবনে কোনোদিনই আর তাদের দেখা পাবার জো থাকত না।

॥ বংশ পরিচয় ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর স্কটল্যান্ডের এডিনবরা শহর। ১৬নং সাউথ শার্লোট স্ট্রিট। এখানেই বসবাস করতেন বেল পরিবার। শিক্ষিত বাগ্মী বক্তা ও নানান বিষয়ে পারদর্শী এই বেল পরিবার। বাড়ির বৃদ্ধ কর্তা আলেকজান্ডার বেল ছিলেন বাগ্মিতার শিক্ষক। পরবর্তী জীবনে তিনি লন্ডনে বাগ্মিতার শিক্ষকতা করতেন। তার দুই পুত্র। একজন থাকতেন ডাবলিন-এ বাগ্মিতার শিক্ষকতার কাজ নিয়ে। অপরজন আলেকজান্ডার মেলভিল বেল। ইনি থাকতেন সাউথ শার্লোট স্ট্রিটের এই বাড়িতে। ইনিও ছিলেন বাগ্মিতার শিক্ষক। বোবা-কালাদের শিক্ষাদানের একাধিক বই লিখেছেন তিনি, আবিষ্কার করেছেন তাদের শিক্ষাদানের নানা পদ্ধতি।

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার মেলভিল বেল ও তাঁর স্ত্রী এলিজা গ্রেস (কুমারী নাম সাইমন্ডস)-এর প্রথম সন্তান মেলভিল জেমস বেল এর জন্ম হয়। বেল পরিবারের প্রথম পুত্র সন্তান। আনন্দের বন্যা বয়ে যায় বেল পরিবারে।

এর ঠিক দু বছর পরে। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ বেল পরিবারে দ্বিতীয় পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। নাম রাখা হয় আলেকজান্ডার বেল। বেল পরিবারে তৃতীয় ও শেষ সন্তান জন্মগ্রহণ করে ঠিক তার একবছর পর ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে। নাম রাখা হয় এডওয়ার্ড চার্লস বেল। বেল পরিবারে কোনো কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি।

॥ শৈশবের দিনগুলি ॥

মেলভিল জেমস, আলেকজান্ডার আর এডওয়ার্ড চার্লস তিনভাই বেল পরিবারের আদর যত্নে বড়ো হতে লাগল। তাদের স্নেহশীলা ও গুণবতী মার কাছে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হল।

শৈশবে আলেকজান্ডার ছিলেন একটু অন্য ধরনের। পড়াশোনার সঙ্গে তিনি ভালোবাসতেন শিল্প, কবিতা ও গান- বাজনা। এসব দিকে তাঁর অনুরাগ দেখে তাঁর মা এলিজা গ্রেস তাঁকে অনুপ্রেরণা দিতেন।

আমরা সাধারণত আদরের ছোট্ট শিশুটির পোশাকি নাম ছাড়াও একটা ছোট্ট ও মিষ্টি ডাকনাম রাখি; আলেকজান্ডার বেলকেও তেমনি একটা ডাক নাম দেওয়া হয়েছিল। বাড়ির লোকজন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও পাড়া পড়শিদের কাছে তিনি ছিলেন 'অ্যালেক'।

বেল পরিবারে ছিল একটা পুরানো পিয়ানো। কাউকে কিছু না বলে ছোট্ট অ্যালেক পিয়ানোয় বসে এলোপাথাড়ি বাজনা শুরু করে দিতেন। কেউ যখন বাজাত পিয়ানোটা তিনি মন দিয়ে তা দেখতেন আর শুনতেন বাজনার সুর কীভাবে বদলে বদলে যায়। রিডগুলিতে চাপ দিয়ে শব্দের তীক্ষ্ণতার তারতম্য তিনি সেই শৈশবেই ধরে ফেলেছিলেন। কোনো শিক্ষকের কাছে শিক্ষাগ্রহণ ছাড়াই ছোট্ট অ্যালেক বেশ ভালোই পিয়ানো বাজাতে পারতেন। তিনি হয়ে উঠলেন তাঁদের পারিবারিক পিয়ানোবাদক। বাড়িতে আত্মীয়বন্ধু এলে তিনি তাঁদের পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতেন।

কিছু একটা উৎসব উপলক্ষ্যে একদিন বেল পরিবারে অনেক আত্মীয়-বন্ধুর সমাগম হয়েছে। সবাই হাসি-গল্পে মশগুল। হঠাৎ অপরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। গুরুগম্ভীর গলায় কে এমন কথা বলল? অচেনা তো কেউই নেই! আবার একই কণ্ঠস্বর। এবার সবাই বিস্ময়ে হতবাক। সবাই সবার মুখের দিকে তাকায়। ঠিক সেই সময় ছোট্ট অ্যালেক হো হো করে হেসে উঠল। এবার আরও বিস্ময়ের পালা। ছেলেটা হাসছে কেন? সবাই তখন অ্যালেকের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ হাসি থেমে গেল। অ্যালেকের মুখ গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল আর তখনই আবার সেই কণ্ঠস্বর। একী! তবে কি অ্যালেক! অ্যালেক এভাবে স্বরবিকৃতি ঘটিয়ে কথা বলছে? সে কী করে হয়? অ্যালেকের তো ঠোঁট বন্ধই ছিল। একটুও নড়েনি। এই শান্তশিষ্ট নম্র ছেলেটা এতও পারে!

হ্যাঁ, ছোটো হলেও আলেকজান্ডারের এই গুণ ছিল। তিনি নিজের স্বরযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে স্বর বিকৃতি ঘটিয়ে যে-কোনো ব্যক্তির কণ্ঠস্বর নকল করতে পারতেন। হরবোলার মতো নানা শব্দ করতে পারতেন মুখে। ঠোঁট না নাড়িয়ে তিনি এমনভাবে কথা বলতেন, মনে হত যেন দূর থেকে কেউ বলছে। এটাকে ভেনট্রিলোকুইজিম বলা যায়। এই স্বরচাতুরি কেউ ধরতে পারত না। বেশ মজা হত বন্ধুদের মধ্যে।

আর পাঁচটা সাধারণ শিশুর মতোই আলেকজান্ডার-এর ছিল অসীম কৌতূহল। প্রকৃতির নানান রহস্য আর বৈচিত্র্য তাঁকে ভাবিয়ে তুলত। নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। দেখতেন মেঘের খেলা। পড়ন্ত বিকালে পশ্চিম আকাশ যখন সিঁদুরে মেঘের রঙে রাঙা হয়ে উঠত অ্যালেক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতেন। দেখতেন কোথায় যেন মিলিয়ে গেল লাল টুকটুকে সূর্য। গোধূলির ম্লান আলোয় ঠায় একা বসে থাকতেন ছাদে। আকাশের কমলা রং ক্রমশ লাল হত। শেষে কেমন যেন বেগুনি দেখাত আকাশকে। ওই দূরের দিকে

তাকিয়ে ভাবত ওখানে যেন একটা নতুন জগৎ আছে। আছে তারই মতো আর একটা ছোট্ট অ্যালেক।

ভোরবেলা পাখিরা যখন জাগে, শুরু করে দিনের কাজ, তখন অ্যালেকের ঘুম ভেঙে যেত তাদের কলকাকলিতে। তিনি ছাদে উঠে যেতেন; দেখতেন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে জগৎ ঊষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে। পুব আকাশে লাল আভা জাগে। আকাশ রাঙা করে সূর্য ওঠে। শুরু হয় নতুন একটা দিন।

শীতকালে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে। হু হু করে শীতল হাওয়া বয়। গাছগুলি যেন শীতে মরে যায়। তারা সব পাতা ঝরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোথা থেকে আসে এত ঠান্ডা হাওয়া। কেনইবা আসে? ছোট্ট আলেক তা জানতেন না। তবে জানতেন সূর্য্যি ঠাকুর তার আলোর সঙ্গে তাপ ছড়িয়ে দেয় পৃথিবীর বুকে। শীতে জর্জর জীবকুল বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

শীতের শেষে যখন বসন্ত আসে, সূর্য্যি ঠাকুরের আলোয় তাপ বাড়ে, ঠান্ডা হাওয়ার প্রকোপ কমে, তখন চারিদিকে জীবনের জোয়ার নামে। মরা গাছের ডাল সবুজ পাতায় ভরে যায়। হাঁজারো লতাগুল্মে ফোটে রাশিরাশি ফুল। কচি সবুজ পাতা আর রং-বেরং -এর ফুলের ভারে নুয়ে পড়ে ডাল। খুশিতে ভরে ওঠে জগৎ। আর সেই খুশির অতি ক্ষুদ্র একটা ঝলক যেন দুলিয়ে দেয় মাতিয়ে দেয় বালক অ্যালেকের হৃদয়।

প্রকৃতির রহস্যের কুল-কিনারা পেতেন না বালক অ্যালেক। হাজার হাজার কী? কেন? মনে ভিড় করে। রাশভারি বাবার কাছে সব প্রশ্ন করতে সাহস পেতেন না। জেনে নিতেন মায়ের কাছে। দাদা মেলভিল আর ভাই এডওয়ার্ডের কাছে গল্প করতেন তার নতুন অভিজ্ঞতার। আর প্রশ্ন করতেন অনেক। সব সঠিক উত্তর তিনি দাদার কাছে পেতেন না।